OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 351 - 356
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 351 - 356
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

‘অপরাজিত’, ‘দেয়াল’ এবং ‘কুলি’ উপন্যাসে গ্রামীণ যুবকদের শহর নিরীক্ষা

ড. শান্তনু প্রধান
Email ID : pradhansantanu89@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Social structure, City life, Social norms, Relationships

Abstract

Just as Bibhutibhushan created Apu in the novel 'Aparajita', the evolution of that can be discerned in the character of Ranjit in Jaya Gowala's novel 'Deyal'. Ranjit also realized the same meaninglessness of lifeless relationships that Apudid when he came to Kolkata. On the other hand, in Mulk Raj Anand's novel 'Coolie', Munnu also went from Shyamnagar to different cities in search of work, and he also experienced the same. Although the perspectives of the three heroes are different, they are troubled by the same problems of city life. Before portraying the problems of city life, it is necessary to look at some features of socio-logical aspects of the city. Eminent sociologist S.C. Dube, in his book 'Bharatiya Samaj' states-

1. In urban life, the traditional social structure becomes somewhat loose and the old social norms become much weaker. As a result, the bonds between family, relatives, and different castes become looser.

2. Human-human relationships become much more impersonal, grooved, and systematized.

3. In urban areas, cold calculations of the advantages that would follow begin to take precedence in the exchange of relationships between individuals and groups. The observance of old rituals and ceremonies and contact with relatives begin to decline.

It is easy and imperative to explore how these attributes of city life are embodied in the three novels.

Discussion

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে বিভূতিভূষণ ‘অপরাজিত’ উপন্যাসে যেমন অপুকে সৃষ্টি করেছেন তেমনি সেই সৃষ্টির বিবর্তন যেন দেখা গেছে জয়া গোয়ালার ‘দেয়াল’ উপন্যাসের রণজিৎ চরিত্রের মধ্যে। অপু শহর কলকাতায় এসে প্রাণহীন সম্পর্কের যে মর্ম উপলব্ধি করেছে, সেই একই উপলব্ধি করেছে রণজিৎ-ও। অন্যদিকে, ইংরেজি উপন্যাস সাহিত্যে মুলক রাজ আনন্দের ‘কুলি’ উপন্যাসে মুন্নুও কাজের সন্ধানে শ্যামনগর থেকে বিভিন্ন শহরে গেছে এবং সেও একই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। তিন নায়কের জীবনের প্রেক্ষিত স্বতন্ত্র হলেও শহর জীবনের একই সমস্যায় তারা বিপর্যস্ত ও বিঘূর্ণিত হয়েছে। এই শহর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 351 - 356
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জীবনের সমস্যার চিত্র তুলে ধরার পূর্বে শহর সমাজতত্ত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখে নেওয়া প্রয়োজন। সমাজতাত্ত্বিক S.C. Dube তাঁর 'ভারতীয় সমাজ' গ্রন্থে বলেছেন—

> ১. শহর জীবনে সনাতনী সমাজ কাঠামো কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে এবং পুরনো সামাজিক অনুশাসনগুলিও
> অনেক দুর্বল হয়ে যায়। ফলে পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও জাতপাতের বন্ধন আলগা হয়ে হয়ে যায়।[১]
> ২. মানুষে মানুষে সম্পর্ক হয়ে ওঠে অনেক বেশি ব্যক্তি-সম্পর্কহীন, কেতামাফিক, নিয়মানুগ।[২]
> ৩. শহরাঞ্চলে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর সম্পর্কের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ঠান্ডা মাথায়
> আখেরের হিসাব বেশি করে প্রাধান্য পেতে শুরু করে। পুরনো সংস্কার ও আচার অনুষ্ঠানের পালন এবং
> আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ কমতে থাকে।[৩]
> ৪. সংস্কৃতি, শিক্ষা, মনোরঞ্জন ও ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের প্রয়োজনীয় যথেষ্ট রসদ নগর জীবনে থাকে এবং তাকে
> প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দেওয়া হয়।[৪]
> ৫. বড় শহরের বস্তি ও ঝুপড়ির বাসিন্দারা সচেতনভাবে শহরের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করলেও প্রধানত
> গ্রামের আচার ব্যবহার ও নিয়ম-রীতি সেখানে কর্তৃত্ব করে।[৫]

শহর জীবনের এইসকল লক্ষণ তিনটি উপন্যাসে কীভাবে রূপলাভ করেছে তার নিরীক্ষা করা যেতে পারে।

বিভূতিভূষণের 'অপরাজিত' উপন্যাসটি ১৩৩৬, পৌষ থেকে ১৩৩৮, আশ্বিন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 'প্রবাসী' পত্রিকায় এবং গ্রন্থাকারে প্রথম খণ্ড, ১৩৩৮, মাঘ (১৯৩২, জানুয়ারি), দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৩৮, ফাল্গুন (১৯৩২, মার্চ) মাসে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের আখ্যানে রয়েছে অপু কাশী থেকে মনসাপোতায় ফিরেছে। কিন্তু নিশ্চিন্দিপুরের মত প্রকৃতি এখানে আর খুঁজে পায়নি। এখানেই সে অন্যের বাড়িতে পূজার্চনা করে মায়ের সঙ্গে দিন কাটায়। কিন্তু পড়াশোনার তাগিদে গ্রামের পাঠশালা শেষ করে কলকাতা যাওয়ার জন্য সে মন স্থির করে। আর সেই কলকাতা যাওয়াতেই তার (অপুর) শহরের রূপ ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচয়। অপু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় পড়তে আসে। কলকাতা যাওয়ার আনন্দে সে আগের দিন সারারাত্রি ঘুমতে পারেনি। শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে হ্যারিসন রোড, আমহার্স্ট স্ট্রীট ঘুরে পঞ্চানন দাসের গলির মেসে উপস্থিত হওয়ার সময় তার চোখে জেগে থাকে শুধু বিস্ময়। এমনকি মোটর গাড়ি, ট্রাম, ইলেকট্রিক পাখা তার কাছে বিস্ময়ের বস্তু। টিউশনি করে পনেরো টাকা আয়ে মেসে থাকতে থাকতে অপু এই শহর সম্পর্কে উপলব্ধি করেছে —

> "কলিকাতা দেওয়ানপুর নয়, এখানে কেউ কাহাকেও পোছে না।"[৬]

শহরে হঠাৎই একদিন শিয়ালদার মোড়ে নিশ্চিন্দিপুরের নীলমণি জ্যাঠার ছেলে সুরেশের সঙ্গে দেখা হওয়াতে সে তাদের শ্যামবাজারের বাড়িতে গিয়ে এই কলকাতা শহরের প্রাণহীন সম্পর্কের মর্ম উপলব্ধি করে।[৭] প্রথম আলাপেই সুরেশ গ্রামের ছেলে অপুর সঙ্গে শহরের আদব-কায়দায় কথা বলেছে। পরে একদিন তাদের বাড়িতে জ্যাঠিমা ও অন্যদের সঙ্গে আলাপ করে অপু বুঝতে পারে শহরের নিয়ম-নীতির বেড়াজালে মানুষ থাকলে কীভাবে দিনদিন পাল্টে যায়। একদা যে গ্রামে মানুষদের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল, শহরে বাস করা এইসব গ্রামীণ আত্মীয়দের কাছে আজ অপু লেশমাত্র খুঁজে পায় না। এদিকে দিনদিন যেন শহরের মেসের জীবনের একঘেয়েমি অপুকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। প্রথম দিকে শহরের এই অভিজ্ঞতা তাকে হতাশ করেনি বলেই গ্রামের আত্মীয় সুরেশদের কলকাতার বাড়ির সাজানো পরিবেশ তার ভালো লাগে। ক্রমশই গ্রামীণ ও আদর্শবাদী অপু কলকাতা শহরের বাস্তব জীবন সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। তাই পরে সুরেশদের বাড়ি যাওয়ার সময়ে তার পোশাকে পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কিন্তু সেখানে কারণে-অকারণে তার যাতায়াতে জ্যাঠিমা বিরক্ত হয়েছে। অপুর মনে কষ্ট হয়েছে কিন্তু কাউকে একথা বলেনি, এমনকি তার মাকেও নয়। অপু কিছুদিন গ্রামে কাটানোর পর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 351 - 356
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কলকাতায় ফিরে এসে এই শহরকে ভালো লাগে। একদিকে নাগরিক মানুষের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অন্যদিকে, শহরের পরিবেশ তাকে শহরের বৈপরীত্যের সন্ধান দিয়েছে। অপুর কলকাতা চেনার জগৎ সংক্ষিপ্ত। পূর্ব পরিচিত বন্ধুদের খুঁজে না পেয়ে সে তার একাকিত্ব মোচনের জন্য শহরে একা একা ঘুরে বেড়াতে থাকে। এই উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে সে কলকাতার নানা রূপ দর্শন করে। এই শহরের মানুষের জগৎ ও জীবন তার কাছে সংকীর্ণ হয়ে দেখা দেয়। অপর্ণার সঙ্গে সাংসারিক জীবন শুরু করার পর ভাড়াটে বাড়িতে উপরতলার ভাড়াটের অনুদার, সংকীর্ণ কথাবার্তা তাকে আঘাত করে। অপুর মূল সমস্যা হল শহর জীবন তার ভাল লাগে না, তাকে মানিয়ে চলতে হয়।

কলকাতায় জীবিকার জন্য টিউশনি, খবরের কাগজের বিক্রি, লোহার জিনিসের দালালি করে সে বুঝেছে, এই শহরে সবকিছুতেই একটা প্রতিযোগিতায় চলতে হয়। চাকরি জীবনেও অপু নিদারুণ একঘেয়েমির স্বীকার হয়। তাই সময়ে-অসময়ে অপুর মন কলকাতা থেকে গ্রামে ফেরার জন্য বিদ্রোহ করত। কিছুদিন পরে সে কলকাতার চাকরি ছেড়ে চলে যায়। এদিকে তার স্ত্রী অপর্ণা হঠাৎ মারা যাওয়াতে সে আরো ভেঙে পড়ে। যদিও সে পরে আবার কাজলকে নিয়ে এই কলকাতা শহরে এসেছে কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। সে আবার পল্লী প্রকৃতির টানে কলকাতাকে ছেড়ে পাকাপাকি ভাবে গ্রামে চলে এসেছে। যদিও অপু গ্রামে নিজে থাকেনি। তার প্রতিনিধি কাজলকে রেখে গেছে। অর্থাৎ অপু নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে দিলেও অপুকে নিশ্চিন্দিপুরের প্রকৃতি মাধুর্যময় জীবন প্রীতির বন্ধনে বেঁধে রেখেছে।

ত্রিপুরার জনজীবন এবং তাদের সমস্যা নিয়ে যাঁরা কলম ধরেছেন তাঁদের মধ্যে একজন জয়া গোয়ালা। জয়া গোয়ালার জন্ম[৮] ত্রিপুরার চা বাগানের এক শ্রমিক পরিবারে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে। জন্মসূত্রে তিনি হিন্দিভাষী হলেও বাংলা ভাষাই ছিল তাঁর মূল অবলম্বন। সংসারে দরিদ্রতার কারণে একাদশ শ্রেণির বেশি পড়াশোনা এগোয়নি। তাঁর প্রথম গল্প 'পলাশপুরের মেয়ে' প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে। 'দেয়াল' উপন্যাসটি তাঁর 'অন্য মানুষ ভিন্ন রঙ' গ্রন্থের অন্তর্গত। যেটি প্রকাশিত হয় ২০০৩ সালে। এই উপন্যাসটিতে রণজিৎ গ্রাম থেকে শহরে গেছে এবং কীভাবে শহরের নানা রূপ দর্শন ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তারই কথা বারে বারে উঠে এসেছে। উপন্যাসটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রণজিৎ-এর উত্থান এবং শহরে টিকে না থাকার ব্যর্থতার কথাই বারে বারে বর্ণিত হয়েছে। রণজিতের জীবনে আমরা তিন ধরনের পর্যায় লক্ষ করেছি—

প্রথম পর্যায় : রণজিতের গ্রাম থেকে পড়াশোনা এবং সাংসারিক স্বচ্ছলতা আনার জন্য শহরে আসা;
দ্বিতীয় পর্যায় : শহরের মেয়েকে বিবাহ এবং নাগরিক শিক্ষিত সমাজে মেলামেশার চেষ্টা;
তৃতীয় পর্যায় : নাগরিক সমাজে টিকতে না পারার ইতিবৃত্ত।

আমরা জানি, মানুষেরা জীবন-জীবিকার সন্ধানে, ভাগ্যান্বেষণে, উচ্চশিক্ষা লাভ, সুচিকিৎসার প্রয়োজনে নগরের বিলাস-বৈভবময় স্বচ্ছল জীবনের আকর্ষণে বিভিন্ন মানুষ গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে চলে আসে। তেমনি এই উপন্যাসের নায়ক রণজিৎ গ্রামীণ চা শ্রমিকের বাড়ির ছেলে হয়েও পড়াশোনা এবং স্বচ্ছল জীবন অন্বেষণের তাগিদে শহরে এসেছে। অতি কষ্টে বন্ধু শাশ্বতর সহচর্যে শহরে একটি স্থান করে নিয়েছে। ছুটির দিনে রণজিৎ তার গ্রামের বাড়িতে গেলে বাবাকে ব্যঙ্গ করে বলতে শোনা গেছে 'শহরিয়া'।[৯] এই কথায় রণজিৎ কিছু মনে না করে সে বলেছে—

> "এই ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ কী জন্য! আমি কি পিকনিক করতে গেছি শহরে? তোদের জন্যই তো। তোদের খুশী করার জন্য, সুখে রাখার জন্যই তো, নাকি!"[১০]

শুধু তাই নয়, ছোটবেলাকার সঙ্গী ছমিয়াও রণজিতের ওপরে শহর থেকে কিছু নিয়ে আসেনি বলে রাগান্বিত হয়েছে। গ্রাম থেকে ফিরে এসে রণজিৎ নিজের অফিসের কাজের দায়িত্বের পাশাপাশি একটি নিজস্ব ঘর ভাড়া করে নিজের মতো করে থাকবার চেষ্টা করেছে। সে তার দায়িত্ববোধের প্রতি সর্বদা সচেতনশীল এবং বাবা-মা ও ভাইকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যদিও সেই বাবা-মাকে না জানিয়ে হঠাৎই ওই ভাড়া বাড়িওয়ালার নাতনি মিনতিকে সে বিয়ে করেছে। পরে অবশ্য শাশ্বত রণজিতের কষ্ট বুঝতে পেরে হঠাৎ-ই সে (শাশ্বত) তার বাবা-মাকে শহরের ভাড়া বাড়িতে এনে উপস্থিত করেছে। শাশ্বতর এই আচরণে বন্ধু রণজিৎ খুশি হয়েছে, কারণ তার দুঃখের জায়গা শুধু শাশ্বতই বুঝতে পেরেছে। মিনতিকে দেখে তার (রণজিতের) বাবা-মার খুব পছন্দ হয়। এ প্রসঙ্গে অবশ্য শাশ্বত বলেছে—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 351 - 356
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "কত মহান, কত উদার ওঁরা! কত না সহজেই মিনতিকে আপন করে নিলেন। শুধু শুধুই তুই নিজেকে কষ্ট দিচ্ছিল। অহেতুক আত্মপীড়ন।"[১১]

গ্রামের মানুষরা যতটা সহজে শহরের মানুষকে আপন করে নেয় শহরের মানুষেরা গ্রামের মানুষকে এত তাড়াতাড়ি আপন করতে পারে না। মা মিনতির কাছে গল্প বলতে গিয়ে 'ছিলোমিলো' শব্দটির প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে ত্রিপুরার চা বাগানকেন্দ্রিক ইতিহাস এবং তাদের ভাষায় কথা উঠে এসেছে—

> "সেই কবে ত্রিপুরায় এসেছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষরা। এই ভারতেই বিভিন্ন রাজ্য থেকে বহু মানুষ এসেছিল ত্রিপুরার চা বাগানে কাজ করার জন্য। শ্রমিক হয়ে। নিজেদের দেশ-গাঁয়ে প্রত্যেকের-ই একটা ভাষা ছিল, যেমন আমাদের ছিল মুণ্ডারি। এখানে এসে ওরা দেখল চা বাগানে কেউ বলছে ওড়িয়া, কেউ ভোজপুরী, হিন্দি, কেউ বা সাঁওতালি কিংবা বাংলা। একসময় দেখা গেল সব ভাষা মিলেজুলে একটা খিঁচুড়ি ভাষা তৈরী হয়ে গেছে, ছিলোমিলো!... ভারতের ভিনভিন্ রাজ্য থেকে চালান হয়ে আসা এই মানুষগুলোই এখানে হিন্দুস্তানী নামে পরিচিত। তাদের মধ্যে যে ভাষাটি সবচেয়ে বেশী চলে, সেটা এই ছিলোমিলোই। যদিও আমাদের আসল ভাষাটা মুণ্ডারি। তবু ছিলোমিলোই আমার মা।"[১২]

রণজিৎ এই ভাষা জানলেও চা-বাগানকেন্দ্রিক মানুষের কথা লিখেছে বাংলা ভাষাতেই। এই লেখার জগতের সঙ্গে মেতে ওঠার প্রেরণা তাকে অবশ্য শাশ্বতই দিয়েছে। শাশ্বত নিজেও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে জড়িত। রণজিৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেতে চাইলেও তাকে অফিসে বারে বারে শুনতে হয়েছে শহরের অর্থনৈতিকভাবে উচ্চবিত্ত মানুষদের পরিহাস—

> "বার বার কানে বাজছিল 'চা বাগানের ছেলে কথাটা। চা বাগানের ছেলে কী কোন আলাদা মানুষ। কিংবা আদৌ মানুষ নয়! অন্যদের যা আছে সবই তো আমারও আছে! এতে এত আশ্চর্যের কী আছে।"[১৩]

এই পরিহাসের কারণ সময়ের ব্যপ্তিতে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এদিকে আবার মিনতি আস্তে আস্তে করে নিজেদের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে রণজিতকে তার বাবা-মা-ভাই-এর থেকে আলাদা করে দেওয়ার চেষ্টা করে। যে মিনতিকে রণজিতের বাবা-মা অতিসহজেই মেনে নিয়েছিল সেই গ্রামীণ বাবা-মাকে সময় কালপর্বে নাগরিক মিনতি আর মেনে নিতে পারছে না। শুধু তাই নয়, একদিকে মিনতি এবং রণজিতের সংসার অন্যদিকে শাশ্বত ও তুলি বৌদির সংসারের চিত্র দেখলে মনে হয় যেন দুই নাগরিক পরিবার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে—

প্রথম পরিবার রণজিৎ ও মিনতি	দ্বিতীয় পরিবার শাশ্বত ও তুলি
১. রণজিৎ ও মিনতির একটি মেয়ে রয়েছে যার নাম হিয়া। ২. গ্রামীণ মানুষ শহরের মেয়েকে বিয়ে করে দাম্পত্য সংকটে পড়েছে। ৩. মিনতি শাশ্বতর সংসারের প্রসঙ্গ এনে রণজিতকে কথা শোনায়। ৪. রণজিৎ নিজে ভাবে আমাদের গ্রামীণ জীবনে এত জটিলতা নেই যতটা রয়েছে এই শহর জীবনের অন্দরমহলে। ৫. মিনতি তার এক বান্ধবীর কথা মতো হিয়াকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চাইলেও রণজিৎ প্রথমে তাতে রাজি হতে চায়নি। শুধু তাই নয়, মিনতি আরো চায় নিজেদের খরচ বাড়াতে রণজিৎ যেন গ্রামের বাড়িতে বেশি টাকা না পাঠায়।	১. শাশ্বত ও তুলি বৌদির কোনো সন্তান হয় নি। ২. শাশ্বতর বিলাসিতার জন্য তাদের দাম্পত্য জীবনে সংকটের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। ৩. মিনতির কানের পাশা কেনার জন্য তুলি বৌদির উদ্দীপনা লক্ষণীয়। ৪. শাশ্বত চায় এই জটিল নাগরিক জীবনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নিয়ে জীবন অন্বেষণ করতে। ৫. তুলি বৌদি শাশ্বতর বাইরের জগতটাকে পছন্দ করে না। সে চায় অজয় মাস্টারের মত শাশ্বত টিউসান করুক এবং

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 351 - 356
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

	প্রচুর অর্থ উপার্জন করে জীবনের গতি বদলে দিক।

লেখিকা এই দুই পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে তপনবাবু ও শর্মিলার সাংসারিক জীবনের কথা বলতে গিয়ে তপন বাবুর অবৈধ সম্পর্কের কারণে ডিভোর্স দেওয়ার কথাও উপন্যাসটিতে উঠে এসেছে। রণজিৎ একদিকে অফিস অন্যদিকে, লেখালেখি জগতের সঙ্গে মিশতে গিয়ে অবসর সময় বেশি পায় না। এদিকে শাশ্বতর মাঝে মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া এবং খামখেয়ালিপনার কারণে রণজিতকে শাশ্বতর জন্য সময় ব্যয় করতে হয়। শাশ্বত যেমন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সময় কাটায় তেমনি নাগরিক জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতায় মেতে উঠতে রণজিৎ প্রত্যক্ষ করেছে। সময়ের প্রেক্ষাপট যত বদলেছে ততই রণজিৎ আপন ভালাবাসার মানুষদেরকে পর হতে দেখেছে। 'মুণ্ডা' হওয়াতে অফিসে তাকে নিয়ে পরিহাস করতে শোনা গেছে। যে শাশ্বত এত কাছের বন্ধু সুখ-দুঃখের ভাগীদার সেও তার বাড়ির বিছানায় রেখেছে রণজিতের জন্য সীমারেখা। পাশের বাড়ির কুকুর সুইটি বিছানায় উঠতে পারলেও সেখানে স্থান হয়নি বন্ধু রণজিতের। এদিকে মানসিক অবসাদ এবং শহরের একাকিত্ব গ্রাস করতে থাকে রণজিতের জীবনে। আজ সে ভুগতে থাকে জীবনের নিঃসঙ্গতায়। রণজিতের এই শহর একাকিত্বের চিত্র দেখলে প্রসঙ্গত আমাদের 'অপরাজিত' উপন্যাসের অপু এবং মুলক রাজ আনন্দের 'কুলি' উপন্যাসের মুন্নু চরিত্রের কথা মনে পড়ে যায়। যেখানে অপু এবং মুন্নু দুজনেই স্বাচ্ছন্দ্য জীবনকাটাতে শহরে এলেও তারা শহরের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকতে পারেনি। কেউ বা শহর ত্যাগ করেছে আবার কেউ করেছে মৃত্যুবরণ। পেয়েছে মুক্তির স্বাদ। রণজিৎ যে বাবা-মার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিল তা রক্ষা করতে সে আজ অপারক। নিজের লোকেদের সঙ্গে শুধু সম্পর্ক নয়, মিনতি চায় রণজিৎ যেন তার 'মুণ্ডা' পদবি কোর্টের মাধ্যমে পরিবর্তন করে 'মণ্ডল' হয়ে যাক—

> "মণ্ডল হবো গো আমি। মুণ্ডা-তে তোমার বড্ড লজ্জা কিনা! একজন ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের একটা সই, আমাকে ফার্স্ট ক্লাস মানুষ বানিয়ে দেবে গো। এই ক্লাসটাই তো আসল। এ দিয়েই তো সব সম্পর্ক গো।"[১৪]

অর্থাৎ, সম্পর্ক আর ভালোবাসার থাকে না, হয়ে যায় পুরোপুরি অর্থভিত্তিক। তাই রণজিতের মনের অবস্থা দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। তার আর সংসার ভাল লাগে না। সাংসারিক দায়-দায়িত্ব থেকে সে আজ হাত গুটিয়ে নিয়েছে। তার লেখার ধরনও গেছে পাল্টে। লেখায় নেই মাটির সেই গন্ধ। তার মনে পড়ে যায় অফিসের প্রথম দিনে বিমলদার মতো লোকের মুণ্ডা রণজিতকে না মানার প্রচেষ্টা—

> "বার বার বলছিলেন বাগানের ছেলে। ওঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না নীচুতলার ছেলেটা ওঁদের মতো লিখতে পারে কিংবা পারবে। বিশ্বাস হচ্ছিল না যতটা, মেনে নিতে পারছিলেন না তার চেয়েও বেশি।"[১৫]

একদিকে শ্রেণিচেতনা এবং অন্যদিকে, শহরের মানুষদের স্বার্থান্বেষী মনোভাব এখানে প্রকাশ পেয়েছে। তাই তারা সবসময় প্রতিযোগিতা করার চেষ্টা করে। এইভাবে রণজিতের জীবন থেকে একে একে ভালোবাসার জিনিসগুলি উধাও হয়ে যাওয়াতে সে আজ পশুতে পরিণত হয়েছে। সে ঘরে হিয়ার সামনে মদ খেয়ে মাতলামি করে। এমনকি মিনতির শরীরকে সে জোর করে পাওয়ার চেষ্টা করে। তাতেও সে খুশি না হওয়াতে চলে গেছে নগরের এক প্রান্তীয় বস্তিতে। মিটিয়েছে সে তার উগ্র কামনাকে। যদিও রণজিতের মনে হয়েছে সে আজ জানোয়ার হয়ে গেছে। মিনতি রণজিতের এই দশা দেখে তাকে মুক্তির জন্য বিষ খাইয়ে দেয়। শেষ দৃশ্যে রণজিৎ তার সারা জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা পুনর্বার স্মৃতিতে যেন দেখতে পাচ্ছে—

> "এই মাঝি-আন্ধার সাঁঝে সত্যিই নিশান্তের রক্তভোর আলো দেখছি-আমি বাঁচব গো বাবা...।"[১৬]

অন্যদিকে, মুলক রাজ আনন্দের 'কুলি' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। এই উপন্যাসের নায়ক মুন্নু গ্রাম থেকে কাজের জন্য তার কাকা দয়ারামের সঙ্গে শ্যামনগরে আসে। এখানে এসে সে দেখেছে অধীনস্থকামী মানুষের মানসিকতা। এখানে সে বেশিদিন টিকতে না পেরে কাজের সন্ধানে শ্যামনগর থেকে দৌলতপুরে হাজির হয়। সেখানে সে ভাল মালিক প্রভুদয়ালকে পেলেও তার ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণে সে স্থানেও মুন্নু স্থায়ী আশ্রয় গড়তে পারেনি। এরপর সার্কাস দলের মাহুতের সহায়তায় সে বোম্বাই শহরে গিয়ে হাজির হয়। এই বোম্বাই শহরেই সে হরি নামক এক বৃদ্ধের সহায়তায় স্যার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 351 - 356
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জর্জ হোয়াইট কটন মিলে কুলির কাজ পায়। কিন্তু ভাগ্যের অমোঘ পরিহাসে সে এখানেও স্থায়ী হতে পারেনি। একদিকে মিলের ধর্মঘট এবং দাঙ্গার পরিবেশে ছোটাছুটি করতে গিয়ে মিসেস মেনওয়ারিং-এর গাড়ির সামনে এসে পড়ে মুন্নু। মিসেস মেনওয়ারিং তার বাড়ি সিমলায় নিয়ে যায় মুন্নুকে এবং সেখানে সেবা শুশ্রূষার পর সুস্থ হলে সেই বাড়িতেই চাকরের কাজ করায়। পরবর্তীতে সে (মুন্নু) রিক্সা করে মেমসাহেবকে পাহাড়ে ঘোরাতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। হাসপাতালে ভর্তিও হয়। কিন্তু সঠিক দেখাশোনার অভাবে মুন্নু সেখানেই মারা যায়। এই দীর্ঘ একাকীত্ব-জীবনে সে অনুভব করে জীবন বীক্ষার দোলাচলতা। এই দোলাচলতা হয়ত এসেছে সময়ের কথকতার বয়ানে। ফলে কখনো 'অপরাজিত' উপন্যাসের অপুকে কখনো 'দেয়াল' উপন্যাসের রণজিৎ-কে, কখনো 'কুলি' উপন্যাসের মুন্নুকে এই সময় ও শহর সমাজ ব্যবস্থার মায়াজালের ঘেরাটোপে আমরা পর্যুদস্ত এবং বিপর্যস্ত হতে দেখেছি। এই তিনজন গ্রামীণ যুবক তিন জায়গার হলেও জীবনের সমস্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও শহরে স্থায়ী আশ্রয় গড়তে চাইলেও সেই আশ্রয় তারা গড়তে ব্যর্থ হয়েছে— কেউবা প্রাণ দিয়ে, কেউবা শহরকে ত্যাগ করে। জীবনের অনন্ত বাসনা তাদের থেকে গেছে মনের অন্তরালে।

Reference:

১. দুবে, এস. সি., *ভারতীয় সমাজ*, (অনুবাদ : রায় রজত), ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ২০১২, পৃ. ৪৪
২. তদেব, পৃ. ৪৪
৩. তদেব, পৃ. ৪৪
৪. তদেব, পৃ. ৪৪
৫. তদেব, পৃ. ৪৪
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *অপরাজিত*, দ্বাদশ মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৬, পৃ. ৬৪
৭. চক্রবর্তী, বিপ্লব, *ভারতীয় উপন্যাসে কলকাতা সমাজতত্ত্ব ও শিল্পরূপ*, প্রথম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৭১
৮. চক্রবর্তী, জয়শ্রী, *লেখিকাদের সমাজ ভাবনা পূর্বাঞ্চলীয় কথাসাহিত্যে*, পুনর্মুদ্রণ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ২১১
৯. গোয়ালা, জয়া, *অন্য মানুষ ভিন্ন রঙ (দেয়াল)*, প্রথম প্রকাশ, অক্ষর পাবলিকেশনস্, ত্রিপুরা, ২০০৩, পৃ. ১৪
১০. তদেব, পৃ. ১৪
১১. তদেব, পৃ. ২৭
১২. তদেব, পৃ. ২৮
১৩. তদেব, পৃ. ৩১
১৪. তদেব, পৃ. ৬৭
১৫. তদেব, পৃ. ৬৩
১৬. তদেব, পৃ. ৭১